প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

পরিকল্পনা

আঞ্চলিক বৈষম্য বনাম বিভেদকারী আঞ্চলিকতাবাদ

সাজ্জাদ জহির | *তারিখ: ১৬-০১-২০১০*

আঞ্চলিক বৈষম্যের সূত্র ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা রচিত হয়েছিল। আজ সেই স্বাধীন দেশেই আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুষ্ঠু সমাজ অগ্রগতির প্রয়োজনে সাধারণভাবেই অর্থনৈতিক বৈষম্য কাম্য নয়। আর বৈষম্য আঞ্চলিক ব্যাপ্তি নিলে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বিভেদমুখী ধারা প্ররোচিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে।

মোট দেশজ উত্পাদন বা জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে বা সেসবের প্রবৃদ্ধির আলোকে বৈষম্য যাচাই সম্ভব। জেলা পর্যায়ে সেসব তথ্য মাঝেমধ্যে পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশ করলেও সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয় না। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে দারিদ্র্যের পরিমাপের ভিত্তিতে অগ্রগতি যাচাইয়ের প্রথা শুরু হয়। কোনো এক জনগোষ্ঠীর শতকরা কত অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে এবং গড় ভোগের পরিমাণ কত—এ দুটো তথ্য প্রতি পাঁচ বছর পরপর (খানা আয়-ব্যয়ের) জরিপের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে সেসবের পরিমাপই আঞ্চলিক বৈষম্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা দেয়।

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে ঘিরে মঙ্গার আলোচনা দীর্ঘকাল চললেও ১৯৯৫-৯৬-এর (আয়-ব্যয়) জরিপের পর আঞ্চলিক ভেদাভেদের তথ্যভিত্তিক আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার উদ্যোগে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দারিদ্র্য মানচিত্র প্রস্তুত হয়, যা খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনায় বিশেষ প্রভাব রেখেছে।

তবে আশ্চর্যের বিষয়, আগের তৈরি মানচিত্র উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলের দুরবস্থা যথার্থভাবে ধরতে পারেনি—এমনকি, ২০০৫ এর জরিপের ফলাফল জানার পরও সাহায্য সংস্থা, সরকার ও সুশীল সমাজের মধ্যে এ বিষয়ে বোধোদয় হতে 'সিডর' ও 'আইলা'র মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রয়োজন হয়েছিল।

বিভিন্ন জরিপ-তথ্য তুলনা করে জানা যায়, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার সর্বাধিক ছিল। নব্বইয়ের শেষাংশে বরিশালে সেই হার অনেক হ্রাস পায়, যা দারিদ্র্যের মাপকাঠিতে বরিশালকে স্থবির খুলনার কাতারে আনে। আর এ শতাব্দীর শুরুতে এ দুটো বিভাগেই স্থবিরতা লক্ষ করা যায়। অথচ যমুনা সেতু চালু হওয়ার পর রাজশাহী বিভাগে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

যদিও ২০০৫ সালের জরিপের তথ্যানুযায়ী, উল্লিখিত তিনটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার প্রায় সমান, অগ্রগতি ও সম্ভাবনার আলোকে অনেকেই মনে করেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চল ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এসবের তুলনায় সামগ্রিক চিত্রে সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্যের হার অনেক হ্রাস পেয়েছে।

মাঠপর্যায়ের তথ্য, খানাভিত্তিক তথ্যের বিশ্লেষণ এবং দারিদ্র্য-মানচিত্রের ভিত্তিতে এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে মঙ্গা-পীড়িত নদীভাঙনের এলাকা, নেত্রকোনা-সিলেটের হাওর এলাকা, আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চল এবং খুলনা-বরিশাল-চট্টগ্রামের উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে বেশি।

গত দু-তিন বছর ধরে আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে বেশ আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ২০০৮ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির মূল দুটো মেরু—ঢাকা ও চট্টগ্রাম—পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। এবং যমুনা ও পদ্মা নদী-সৃষ্ট ভৌগোলিক বিভেদের কারণে পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এলাকা ওই দুটো মেরুর প্রবৃদ্ধির সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আমাদের অনেক চিন্তাবিদের মধ্যেও সমধর্মী আরেকটি চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়, যা নিম্নোক্ত উক্তিতে ধরা পড়ে: 'মঙ্গাপীড়িত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দারিদ্র্যের কেন্দ্রবিন্দু দক্ষিণাঞ্চলে সরে গিয়েছে'। শুনে মনে হয়, দারিদ্র্য যেন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা অতীতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানত এবং বর্তমানে দক্ষিণে আঘাত হানছে।

আবার উভয় ক্ষেত্রেই নীতি-পরামর্শে সাদৃশ রয়েছে—দরিদ্র মানুষের 'নিরাপত্তা বেষ্টনী'র জন্য সাহায্য-সম্পদ বণ্টনে এখন থেকে দক্ষিণাঞ্চলকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হলেও আবেগের ধূম্রজালে আমাদের উন্নয়ন-ধারা ও তা থেকে সৃষ্ট বৈষম্যের কারণের প্রতি অন্ধদৃষ্টি রাখলে ভুল হবে। আর কারণ খুঁজে না পেলে সমাধান আয়ত্তের বাইরে রয়ে যাবে।

তা ছাড়া যাঁরা এ জাতীয় সাহায্যদানের কথা বলছেন, তাঁরা কেউই নিঃশর্তে সীমাহীন ভান্ডার খুলে দেননি। বরং, 'দাতা' হিসেবে অভিহিত অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব-সাহায্য বিতরণে নিজের দখলী নিশ্চিত করতে অধিক আগ্রহী।

অর্থনীতির পরিভাষায়, উত্পাদনের উপকরণ ও উত্পাদিত পণ্য নির্বিবাদে চলাচলের (স্থানান্তরের) সুযোগ থাকলে যেকোনো স্থানের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুফল সংযুক্ত অন্যান্য এলাকায়ও পৌঁছানোর কথা। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এ যুক্তি দেওয়া হলেও সেখানে শ্রম চলাচলে বিশাল অঙ্কের আর্থিক খরচের বাইরেও ভিসা নামের বাধা রয়েছে, আর পণ্য চলাচলে রয়েছে আমদানি শুল্কসহ নানা বাধা-নিষেধ।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে আইনের সে রকম বাধা নেই। তবে যাত্রী ও পণ্য চলাচলে খরচ আছে। তাই মজুরি আয় অথবা পণ্যের দাম এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় কমবেশি হতে পারে। এমনকি এক এলাকার প্রবৃদ্ধি সমভাবে অন্য এলাকাগুলোতে বিস্তৃত নাও হতে পারে।

শ্রম, কাঁচামাল বা পণ্যের মতো উত্পাদনের অনেক উপকরণ (সম্পদ) সহজে চলাচল করতে পারে না এবং উত্পাদনে অপরিহার্য এ রকম কিছু সম্পদের বণ্টন আঞ্চলিক বৈষম্যের মূল কারণ হতে পারে। যেমন, বাঁধ নির্মাণ করে জমির উত্পাদিকা বৃদ্ধি অথবা রাস্তা তৈরি করে বাজার-সংযুক্তি বৃদ্ধি একটি এলাকাকে অধিকতর উন্নত হওয়ার সুযোগ দেয়। তাই এ জাতীয় ভৌত কাঠামো নির্মাণে সরকারি বিনিয়োগে পক্ষপাতিত্ব থাকলে তা আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়ায়। বিশেষ জ্বালানি বণ্টনের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি।

ডিজেল তেল বা কয়লা সহজে স্থানান্তরযোগ্য। কিন্তু বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজন পাইপলাইন-ভিত্তিক বিতরণব্যবস্থা। তবে এ জাতীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা ব্যয়বহুল।

সংগত কারণেই উত্সস্থলের কাছাকাছি এলাকাগুলো গ্যাসপ্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পেয়েছে, যা যমুনা সেতু চালু হওয়ার আগে পূর্বাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুরুতে সার উত্পাদনে গ্যাসের ব্যবহার চালু হয়। পরে বিদ্যুত্ উত্পাদন ও অন্যান্য শিল্পে গ্যাস ব্যবহার উন্মুক্ত হলে এটিই বিনিয়োগ আকর্ষণের মূল নিয়ামক হয়। আর গৃহস্থালি কাজে গ্যাসপ্রাপ্তি জীবনযাত্রাকে সহজ করায় বিনিয়োগের জন্য আবশ্যিক দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্তি গ্যাসপ্রাপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি রাস্তাঘাটে (বিশেষত, গ্রামীণ অবকাঠামোতে) ব্যাপক বিনিয়োগে শ্রমের চলাচল সহজ হয়। সে তুলনায় রেল ও নদীপথে নজর না দেওয়ায় পণ্য বহনের খরচ কমেনি। গ্যাস ব্যবহারের শেষ পর্যায়ে যানবাহনে সিএনজি চালু হয়। এর দ্বারা উপকৃত এলাকায় পণ্য বহনের খরচ অনেক কমে। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েছে।

তার মানে নদী-সৃষ্ট ভৌগোলিক বিভাজন বা আকস্মিকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তরাঞ্চল থেকে (খরা ও নদীভাঙন) দক্ষিণাঞ্চলে (সিডর বা আইলা) সরে আসায় আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়নি। বরং অবকাঠামোতে বিনিয়োগে আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব, যোগাযোগব্যবস্থায় সড়ক ও মোটরযান-নির্ভরতা এবং গ্যাসের মতো দুর্লভ সম্পদ ব্যবহারে সঠিক নীতিমালার অভাবেই আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়েছে।

যদি ভবিষ্যতে গ্যাস উত্তোলন ও দেশের অভ্যন্তরে তা বিতরণের সম্ভাবনা থাকে, তার খাতওয়ারি ও অঞ্চলভিত্তিক সর্বোত্তম (পাইপলাইন-ভিত্তিক) বণ্টন কী হওয়া উচিত, ভেবে দেখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার প্রতিটি শহরে কি গ্যাস পৌঁছে দেওয়া ঠিক? নাকি সার্বিক বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট উন্নয়নকেন্দ্র চিহ্নিত করে সেখানে গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা উচিত? আর এটা তো স্পষ্ট যে ঢাকাকেন্দ্রিক নগরায়ণ টেকসই নয়, যা প্রতিনিয়ত নগরবাসী উপলব্ধি করছে। এ ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা জরুরি।

এটা অনস্বীকার্য যে এক এলাকার অধিবাসী কোনো প্রাকৃতিক সম্পদে অগ্রাধিকার পাওয়ায় অন্যদের চেয়ে লাভবান হয়েছে। তবে শিল্পায়নের মতো ভোক্তা পর্যায়েও বৈষম্য আছে। দক্ষিণাঞ্চলের একটি পরিবার প্রতি মাসে সিলিন্ডার গ্যাসে এক হাজার টাকার বেশি ব্যয় করে। তার থেকেও বেশি গ্যাস ব্যবহার করে ঢাকায় একটি পরিবার মাত্র ৪৫০ টাকা দেয়। এ জাতীয় ক্ষেত্রে সমতা আনার লক্ষ্যে গৃহে প্রাপ্ত গ্যাসের ওপর অতিরিক্ত করারোপ করে সিলিন্ডার গ্যাসে ভর্তুকি দেওয়ার কথা ভাবা যায়।

তুলনামূলকভাবে পণ্য চলাচল সহজ ও সাশ্রয়ী হলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পেতে পারে। অনেক পণ্যের রেল ও নৌপথে স্থানান্তর সুলভে সম্ভব। পাশাপাশি পণ্য যাতায়াতে চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য হয়রানি দূর করা আবশ্যক।

সম্পদের সর্বোত্তম আর্থিক ব্যবহার ও আঞ্চলিক সাম্যতার মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধ পরিবার, গোষ্ঠী, দেশ, আন্তর্জাতিক—সম্পদ-বণ্টনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তার পরও মানুষ সমতা খোঁজে, তবে তা নির্ভর করে নিজ অবস্থানের ওপর। যিনি বিশ্বব্যাপী বিচরণ করেন, তাঁর দৃষ্টিতে ঢাকা-চট্টগ্রামের সীমিত করিডরে দুর্লভ জ্বালানি সম্পদের ব্যবহার অধিক দক্ষ মনে হতে পারে। আবার যিনি ভিন্ন বিচারে দেশে সমতা খোঁজেন, তাঁকে ভিন্ন মাপকাঠিতে দুর্লভ সম্পদের বণ্টন-নীতি প্রণয়ন করতে হবে। তবে তিনিও সম্ভবত চাইবেন না, ঢালাওভাবে দুর্লভ সম্পদের ক্ষীণ বিতরণ করে ব্যবহারের অদক্ষতা বাড়াতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেন এই দুইয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পান—সেটাই প্রত্যাশা।

সাজ্জাদ জহির: অর্থনীতিবিদ, পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ।
sajjadzohir@gmail.com

প্রথম আলো
সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬
ই-মেইল :info@prothom-alo.com